এডেলেইডে সাতদিন

প্রদীপ দেব

০৬

বিকেল তিনটা পর্যন্ত প্যারালাল সেশানে কাটিয়ে ইউনিয়ন হাউজের পাঁচতলায় গেলাম নিউক্লিয়ার এন্ড পার্টিক্যাল ফিজিক্সের পোস্টার প্রদর্শনী দেখতে। ঘুরে ঘুরে পোস্টার দেখছিলাম। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলাফল পোস্টার আকারে প্রদর্শন করা হচ্ছে। আমার নিজের গবেষণার সাথে একটি গবেষণার মিল ছিলো কিছুটা। কনফারেনস হ্যান্ডবুক থেকে সেই পোস্টার নাম্বার দেখে সেখানে গিয়ে দেখি জায়গাটা খালি। তার মানে তিনি আসেননি। এখানে সামিনা মাসুদের পোস্টার থাকার কথা। পাকিস্তানের কায়েদ-ই-আজম ইউনিভার্সিটির সামিনা মাসুদ। হয়তো সরকারী অনুমতি মেলেনি এখানে আসার। হয়তো বা ভিসা পাননি। এদেশে এখন পাকিস্তানীদের ভিসা পাওয়া খুব সহজ নয়।

জুয়ানের একটা পোস্টার আছে এখানে। সেটার কাছে যেতেই সে টেনে নিয়ে গিয়ে একজনের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলো। তানিয়া। তানিয়া জে শুক। জার্মান। অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে নিউক্লিয়ার ফিজিক্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এ একবছরের এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামে এসেছে। প্রথম আলাপেই কেমন যেন ভালো লেগে গেলো তানিয়াকে। নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের বিভিন্ন সেশানে তাকে দেখেছি গভীর মনযোগ দিয়ে বক্তৃতা শুনতে। এই কনফারেনসে সে বক্তৃতা দিচ্ছে না, তবে একটা পোস্টার আছে তার। তার পোস্টারটা নিয়ে অনেকক্ষণ কথা বললাম। সে আমার গবেষণা সম্পর্কে জানতে চাইলো। তানিয়ার চেহারাটার সাথে আমার খুব আপন কোন মানুষের চেহারার মিল আছে বলেই হয়তো তানিয়াকে খুব আপন মনে হচ্ছে আমার। নিঁখুত একটা মিষ্টি মুখ তানিয়ার। দেখলেই তার ছোট করে ছাটা এলোমেলো কালো চুলগুলোকে আরো এলোমেলো করে দিতে ইচ্ছা করে। জার্মানীতে মনে হয় তানিয়ারা সংখ্যালঘু। হিটলার জার্মানীকে সোনালীচুলের বিশুদ্ধ আর্যদের দেশ বানাতে চেয়েছিলো। যদিও হিটলার নিজে ছিলো কালো চুলের মানুষ। তানিয়ার সাথে আরো কিছুক্ষণ কথা বলতে ইচ্ছে করছিলো, কিন্তু প্রফেসর সছবেরী এসে ডেকে নিয়ে গেলেন তাঁর পোস্টারের দিকে।

তানিয়ার পোস্টারের পাশেই প্রফেসর অ্যান্ড্রু সছবেরীর পোস্টার। এই প্রফেসরটি মেলবোর্ন ইউনিভার্সিটির ছাত্র ছিলেন। কেন্‌কে ভালো ভাবেই চেনেন। তাঁর সাথে বিশুদ্ধ পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণা নিয়ে আড্ডা জমে গেলো। তিনি এক্সপেরিমেন্টাল ফিজিসিস্ট, আমি থিওরেটিক্যাল। আমরা এক গ্রুপ অন্য গ্রুপের সমালোচনাও যেমন করি, আবার একে অন্যকে ছাড়া কাজও করতে পারিনা। মেলবোর্ন ইউনিভার্সিটির অনেকের পোস্টার আছে। সবার কাছে একটু একটু করে যেতে হলো। এক্স-রে অপটিক্স গ্রুপের এসোসিয়েট প্রফেসর ডক্টর রবার্ট একটা পোস্টার এনেছেন এবং সাথে তাঁর সম্প্রতি কেনা ডিজিটাল ক্যামেরাটাও

নিয়ে এসেছেন। তাঁর পোস্টারের সামনে যেই যাচ্ছে রবার্ট সাথে সাথে ছবি তুলে নিচ্ছেন। আমাদের মুটকো মেয়ে ট্রেসি আমাকে বললো,
- রবার্ট ইজ এজ ব্যাড এজ ডেভিড।
ডেভিড মানে ডক্টর ডেভিড পেটারসন। ডেভিডেরও ফটোতোলার বাতিক আছে। বলাবাহুল্য ট্রেসিকে সারাক্ষণ রবার্টের আশেপাশেই ঘুরঘুর করতে দেখলাম।

সন্ধ্যে সাতটায় কনফারেনস ডিনার। এডেলেইডের সবচেয়ে দামী হোটেলে। হোটেল হায়াত রিজেন্সী এডেলেইড। ছোটখাট একটা টিলার ওপরে এই চমৎকার ফাইভ স্টার হোটেল। হোটেলের সামনে সুন্দর ফোয়ারা। তার নিচে বেশ বড় একটা গুহার মতো আছে। গুহার দেয়ালে আদিবাসীদের আঁকা বিভিন্ন দেয়ালচিত্র শোভা পাচ্ছে। গুহার দু'দিকে সিঁড়ি। সিঁড়িগুলো দেখতে বেশ পুরোনো মনে হয়। আসলে এভাবেই তৈরি করা হয়েছে এগুলো। সাতটা বাজেনি তখনো। সিঁড়িতে বসে আছি আমরা কয়েকজন। আজ কিন্তু কেউ হাফপ্যান্ট বা টী-শার্ট পরে আসেনি। সবাই বেশ সেজে গুজে এসেছে। ছেলেরা প্রায় সবাই কোট টাই পরে এসেছে। আজ আমাকেই মনে হচ্ছে একমাত্র ক্যাজুয়েল। না, তানিয়াও কিছু সাজগোজ করে আসেনি। পোশাকও বদলায়নি সে এখানে আসার আগে। মনে হচ্ছে সে যেমন আছে সেভাবেই তাকে সবচেয়ে আকর্ষণীয় লাগছে। আমি কীভাবে যেন জুয়ানসহ আরো কয়েকজনকে পাশ কাটিয়ে তানিয়ার পাশে এসে বসে পড়েছি। বহুদিন পরে আড্ডা জমেছে। আন্তর্জাতিক আড্ডা। আমার একপাশে জার্মান, অন্যপাশে সুইডিশ। সামনে পেছনে অস্ট্রেলিয়ান আর চায়নিজ। তানিয়া ভবিষ্যতে ইঞ্জিনীয়ার হবে শুনে মনে হলো সেই ইংরেজি প্রবাদটির কথা। বলার লোভ সামলাতে পারলাম না,
- হ্যাভেন ইজ এন ইংলিশ পুলিসম্যান, এ ফ্রেনস কুক, এ জার্মান ইঞ্জিনীয়ার, এন ইটালিয়ান লাভার এন্ড এভরিথিং অর্গানাইজড বাই দি সুইস।
তানিয়া হাসতে হাসতে বললো,
- ডোন্ট টেল মী দ্যাট ইউ আর এন ইটালিয়ান।
হাসলে এই মেয়েটাকে যে কত মায়াবী লাগে তা কি সে জানে? আমি জানিনা কী ভাবছিলাম, হঠাৎ জুয়ানের কথায় সম্বিৎ ফিরে পেলাম।
- তোমার বক্তৃতা কখন কাল?

আমার বিশ্বসংসার হঠাৎ অন্ধকার হয়ে গেলো। কালকেই যে আমার বক্তৃতা তা আমি ভুলে গিয়েছিলাম। কনফারেনস ডিনারে আসবো না এরকমই ভেবে রেখেছিলাম। কিন্তু কী যে হয়ে গেলো! এসময় ঘরে বসে আমার বক্তৃতা প্র্যাকটিস করার কথা, আর আমি কিনা এখানে বসে আড্ডা মারছি। না, যথেষ্ট হয়েছে। এবার কেটে পড়তে হবে। সাতটা বাজলে সবাই যখন আস্তে আস্তে ভেতরে ঢুকছে, আমি চোরের মতো চলে আসছিলাম কাউকে কিছু না বলে। কিন্তু তানিয়ার দৃষ্টি এড়ালো না ব্যাপারটা। সে এগিয়ে এসে বললো,
- চলে যাচ্ছো তুমি?
- হ্যাঁ, আমার লেকচার রেডি করতে হবে।
- খাবে কোথায়?
- যাবার পথে কিনে নিয়ে যাবো কিছু।

- ঠিক আছে, যাও। কাল দেখা হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষপরীক্ষা দিয়েছিলাম সাত বছর আগে। আজ এতদিন পরে পরীক্ষার পূর্বরাত্রির মতোই মনে হচ্ছে। বক্তৃতাটা আমার নিজের ভাষায় হলে কোন ব্যাপারই ছিলো না। এখন বিষয় এবং ভাষা দু'টোর জন্যই ভাবতে হচ্ছে। অবশ্য কেন্ আমার বক্তৃতা শুনেছেন ডিপার্টমেন্টে। আমাদের থিওরী গ্রুপের যে কয়জন আমরা এসেছি, এখানে আসার আগে একদিন ডিপার্টমেন্টে সেমিনার টক্ দিয়ে এসেছি সবাই। সেখানে নানারকম প্রশ্নের উত্তরও দিতে হয়েছে। কোন অসুবিধা হবে না আশা করছি। তাছাড়া এখানে সবাই জানার জন্য প্রশ্ন করে। আমাদের দেশের মতো নিজেকে জাহির করার জন্য বা অন্যকে অপদস্থ করার উদ্দেশ্যে কেউ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেনা এখানে। আমার বক্তৃতার স্লাইডগুলি সব ঠিক আছে কিনা দেখে নিয়ে শুয়ে পড়লাম। মনে মনে রিহার্সাল দিয়ে নিলাম আরেকবার। বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা দেয়া এখানে একটু জটিল কাজ এই কারণে যে সময়টা খুব কম। সতেরো মিনিটের ভেতর তোমার যা বলার বলতে হবে এবং পরবর্তী তিন মিনিট প্রশ্নোত্তর পর্ব। অপ্রয়োজনীয় কোন শব্দ উচ্চারণ করার বা শব্দ হাতড়াবার সময় নেই। আমার স্লাইডের সংখ্যা মোট বিশটি। প্রতিটি স্লাইডের জন্য এক মিনিটেরও কম সময় বরাদ্দ। স্লাইড বদলানোর সময়ও কথা থামানো যাবে না।

দেখা যাক কী হয়। এখানকার ছেলেমেয়েরা এসবের থোড়াই কেয়ার করে। কারণ তাদের শিক্ষাব্যবস্থার ভেতরেই আছে এ ধরণের উপস্থাপনার ছড়াছড়ি। শিক্ষাজীবনের প্রায় সর্বত্র তাদের নিজ নিজ বিষয়ে বলতে হয়। তারা আমাদের মতো মুখস্থ করে পরীক্ষায় একটানা লিখে আসতে পারে না সত্য, কিন্তু তারা যা জানে তা নিয়ে বলতে পারে। এসব এখন চিন্তা করে কী হবে! আমি তো আমার এতদিনের শিক্ষা পদ্ধতি একদিনে বদলাতে পারবো না। সুতরাং আমাকে খাটতে হবে।

চোখ বন্ধ করে পড়ে আছি। ঘুমও আসতে দেরী করছে আজ। মনে হচ্ছে ঘুমের মধ্যে এমন কোন স্বপ্ন দেখবো; বক্তৃতা দিতে উঠেছি অথচ একটা শব্দও বের হচ্ছে না আমার মুখ দিয়ে, অনবরত ঘামছি ইত্যাদি। কিন্তু না, কোন রকম দুঃস্বপ্ন ছাড়াই ঘুমিয়ে পড়লাম একসময়।